BAUSTJ
BAUST Journal

হরিশংকর জলদাসের ছোটগল্প: প্রান্তজনের জীবনবৃত্ত

Rakibul Hasan[1*] and Maliha Tabassum Momo[2]

[1]Department of Arts and Sciences, Bangladesh Army University of Science and Technology, Saidpur, Bangladesh
[2]Cantonment Public School and College, Saidpur, Bangladesh

emails: *[*1]rakibulhasanbangla440@gmail.com and [2]tabassummomomaliha@gmail.com ('*' - corresponding author)*

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 10th January 2025
Revised: 28th March 2025
Accepted: 25th April 2025
Published online: 7th May 2025

Keywords:

Bengali Short Story
Subaltern
Class Struggle
Socio-economic Condition
Reality of Life

ABSTRACT

One of the most brilliant branches of Bengali literature is the short story. Bengali short stories, akin to Bengali poetry, serve as a rich wellspring of creativity. Since its inception, Bengali short stories have been imbued with a life-oriented pace. Marginal involvement stands as an inevitable theme within these narratives. While various forms and identities of lower-class life find natural expression in ancient and medieval literature, modern writers consciously delve into the consciousness of the lower class. The Bengali equivalent of the English term 'subaltern' is 'lower class', a term first used by Indian historian Ranjit Guha to refer to a class inferior in power, authority, and socio-economic status, subjected to rule and exploitation. Despite changes in rulers throughout Bengal's feudal and power-driven society from the Mauryas and Palas to the Mughals and English, the lower class, known as Antyajan, has perennially suffered poverty and deprivation of rights. Bangladeshi short story writers meticulously portray the lives and lifestyles of both the haves and the have-nots. Harishankar Jaladas (May 3, 1953), known as Jalputra in Bangladeshi fiction, places utmost importance on lower-class individuals in his diverse subjects and characterizations. Particularly, Jaladas highlights the life struggles of the Dhibar society in his works. His characters are devoid of fantasy, preferring the simplicity of lower-class life. A life he has known intimately since childhood. Jaladas' childhood and adolescence, and indeed most of his life, were spent among lower-class individuals. Through his meticulous depiction of the multi-colored reality of lower-class life, he achieves artistic excellence. This essay aims to unveil the nuances of lower-class lifestyles reflected in Harishankar Jaladas' stories and assess the author's skill in portraying these lives.

© 2025 BAUSTJ. All rights reserved.

১. সূচনা

সমাজবিজ্ঞানে প্রান্তজন বা Marginal Man তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক বিশ্বে Marginal Man বা প্রান্তিক মানবের ধারণা নিয়ে গবেষণার ব্যাপক পরিসর সৃষ্টি করেছে। দুই ভিন্ন সাংস্কৃতিক বাস্তবতার মধ্যে আটকে পড়া মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ত সংগ্রামশীল সত্তা বোঝানোর জন্য প্রান্তিক মানব সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত করেন রবার্ট এজরা পার্ক (১৮৬৪-১৯৪৪)। তিনি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে 'American Journal of sociology' পত্রিকায় 'human migration and marginal man' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখার সাঁইত্রিশ বছর পরে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রুথ জনস্টন লেখেন, "The concept of the *'Marginal Man'*: A New Approach" প্রবন্ধ। প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন-

> In the present context marginality is understood in terms of a cultural conflict experienced by people living into different culture milieus. The two cultures in question are usally arranged in hierarchy. One of the carries power and prestige and is usally referred to us the dominant culture.

> The other is evaluated as being inferior to the first (Johnston, 1965, p. 47).

'প্রান্ত' এবং 'জন' সহাবস্থানে গঠিত প্রান্তজন। 'প্রান্ত' শব্দের আভিধানিক অর্থ- সং (প্র+অন্ত) বি প্রাদি, অর্থাৎ শেষসীমা, কিনারা, ধার, অবধি (চট্টোপাধ্যায়, ২০০০, পৃ. ৫৪৪)।
'জন' শব্দের আভিধানিক অর্থ সং ($\sqrt{}$ জন+অ) বি-

১) মানুষ, লোক [জনবহুল; জন সম্পদ]

২) সাধারণ মানুষ, সর্বসাধারণ

৩) গণ, সমূহ (গোষ্ঠী-জন)

৪) দিনমজুর, শ্রমিক, দৈনিক মজুরিতে কাজ করে এমন লোক (চট্টোপাধ্যায়, ২০০০, পৃ. ৫৪৪)।

প্রান্ত+জন শব্দ দুটি একত্রে 'প্রান্তজন'-এর অর্থ দাঁড়ায় শেষ সীমা বা কিনারায় অবস্থিত সাধারণ মানুষ। প্রান্ত শব্দটির পরিভাষা Margin-এর অর্থ কিনারা, প্রান্ত । Marginal এর অর্থ প্রান্তীয়। প্রান্তীয় শব্দটি প্রান্তিক, প্রান্তবর্গীয়, প্রান্তদেশীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কায়িক শ্রমে নিযুক্ত, সামাজিকভাবে অবহেলিত এবং অনগ্রসর, ক্ষমতাহীন, আর্থসামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, উচ্চবর্গ কর্তৃক শোষিত এবং আর্থিক বিচারে নিম্নস্তরের প্রান্তিক মানুষরাই নিম্নবর্গ হিসেবে আখ্যায়িত। সাবঅল্টার্ন সম্পর্কে আন্তোনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) যে মতামত দিয়েছেন তা অনুসরণ করে ইতিহাসবিদরা নিম্নবর্গের জীবনচর্যা, তাদের আচার-আচরণ, ভাবাদর্শ অনুসন্ধান করে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন।

সমাজ বা রাষ্ট্রে শুধুমাত্র ক্ষমতাকাঠামোর উপর নির্ভর করে নিম্নবর্গ বা প্রান্তবর্গীয় প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। সমাজকাঠামোয় যারা ক্ষমতা বা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে শক্তিশালী হয় তাঁদেরকে আমরা বলি উচ্চবর্গ আর তার তুলনায় ক্ষমতা বা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত নিচে থাকা শেণিকে বলা হয় নিম্নবর্গ বা অন্ত্যজ। ইংরেজি 'সাবঅল্টার্ন' (Subaltern) শব্দের পরিভাষা রূপে নিম্নবর্গ শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য, মিলিটারি বা সামরিকবাহিনীর ক্ষেত্রে ইংরেজি 'সাবঅল্টার্ন' শব্দটির বিশেষ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সেখানে ক্যাপ্টেন থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থিত পদবির অফিসারদেরকে বলা হয় 'সাবঅল্টার্ন'। "তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত" (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৮, পৃ. ২)।

আমরা সর্বপ্রথম নিম্নবর্গ (সুবলতের্নো) শব্দের উল্লেখ পাই আন্তোনিও গ্রামশির (১৮৯১-১৯৩৭) প্রিজন নোটবুকস (১৯৫০) গ্রন্থে। তিনি মুসোলিনির কারাগারে বন্দি থাকাকালে (১৯২৯-১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ) মার্কস কথিত প্রোলেতারিয়েত শ্রমিক শ্রেণিকে নিম্নবর্গ হিসেবে উল্লেখ করেন (হাসান, ২০০৮, পৃ. ১৮)। নিম্নবর্গের ঠিক বিপরীতেই তিনি 'হেমজেনিক' বা আধিপত্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণির অবস্থানকে নির্দেশ করেছেন। তবে গ্রামশি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ছাড়াও, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বে নিম্নবর্গ শ্রেণির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রামশির রচনায় বিশ শতকের শুরুর দিকে পুঁজিবাদী বিকাশের অসম্পূর্ণতার পটভূমিতে সামন্ত শ্রেণি কর্তৃত্ব ও কৃষক শ্রেণির অধীনতার সাধারণ চরিত্রই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে তিনি আধিপত্য ও অধীনতার বৈশিষ্ট্য সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যায়, সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে এক প্রান্তে অবস্থান করে প্রভুত্ববিস্তারকারী 'ডমিন্যান্ট' শ্রেণি, আর তার বিপরীত মেরুতে বাস করে তাদের অধীন 'সাবঅল্টার্ন' শ্রেণি (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৮, পৃ. ৩)।

মূলত সাবঅল্টার্ন সম্পর্কে আন্তোনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) যে মতামত দিয়েছেন তা অনুসরণ করে ইতিহাসবিদরা নিম্নবর্গের জীবনচর্যা, তাদের আচার আচরণ, ভাবাদর্শ অনুসন্ধান করে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। অধস্তন, নিম্নস্থিত বা নিম্নবর্গ এই ধারনাটি ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ ও ইতিহাসকে উপজীব্য করেই প্রয়োগ এবং বিস্তার ঘটেছে। বলা যায়, কার্ল মার্ক্সের তত্ত্বেও সীমাবদ্ধতার জায়গায় প্রশ্ন তুলেই নির্মিত হয়েছে নিম্নবর্গ ধারণার প্রেক্ষাপট।

রণজিৎ গুহ 'সাবঅল্টার্ন'-এর বাংলা পরিভাষা রূপে 'নিম্নবর্গ' শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৮, পৃ. ২)। তাঁর 'Subaltern Studies' পাঠ করলে জানা যায়, ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তা উচ্চবর্গের দ্বারা লিখিত ইতিহাস। স্বাভাবিকভাবে সেখানে উচ্চবর্গের প্রতি চলে আসে পক্ষপাতিত্ব এবং নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতি-ধর্মচেতনা ইত্যাদি হয়ে পড়ে উপেক্ষিত। এই উপেক্ষিত শক্তির জাগরণে নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র ইতিহাস-চর্চার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সমালোচক দীপেশ চক্রবর্তীর মতে নিম্নবর্গের এই

ইতিহাসচর্চার প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য হলো, “To make the subaltern the sovereign subject of history, to listen to their voices, to take their experience and thought” (Chakrabarty, 2000, p. 102).

সাহিত্য সমালোচক ও তাত্ত্বিক গায়ত্রী চক্রবর্তী তাঁর ‘Can the subaltern Speak?’ প্রবন্ধে প্রত্যাশা করেছিলেন নিম্নবর্গের এমন এক ইতিহাস হওয়া উচিত, যেখানে তাদের ‘কথা’ উঠে আসবে গুরুত্বের সঙ্গে। যখন ইতিহাসবিদ রনজিৎ গুহ ও অন্যান্য তাত্ত্বিকরা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা শুরু করেন তখন মনে হয় গায়ত্রী চক্রবর্তীর অভীপ্সা বাস্তবে রূপ নেয়। রণিজিৎ গুহদের নিম্নবর্গ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস যেমন আলোর মুখ দেখে, তেমনি নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বিচিত্র দিক সম্পর্কেও জানা যায়। পূর্বে উল্লিখিত ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে দেশি-বিদেশি-সরকারি-বেসরকারি প্রভুশক্তিকে উচ্চবর্গ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এই কর্তৃত্ববাদী উচ্চবর্গের বাইরে সকল ব্যক্তি কিংবা ‘সমূহ’ কে বিবেচনা করা হয় নিম্নবর্গ হিসেবে। ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, দরিদ্র শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত, গ্রাম ও শহরের গরিব ‘জনতা’, আদিবাসী, নিম্নবর্ণ, এমনকি নারীরাও নিম্নবর্গের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। আর এই নিম্নবর্গ মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সম্যক ধারণা বাংলা ছোটগল্পে চমৎকারভাবে পরিলক্ষিত হয়। নিম্নবর্গের ইতিহাস সাম্প্রতিককালে চর্চিত হলেও, বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকেই নিম্নবর্গের জীবন নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের ছোটোগল্পকারদের গল্পে নিম্নবর্গের জীবনচিত্রকে নানা বর্ণে ও রেখায় চিত্রিত হতে দেখা যায়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে হরিশংকর জলদাসের প্রকাশিত গল্পগুলোর মধ্যে ‘কোটনা’, ‘দুখিনী’, ‘দুলারি এবং কয়েকজন’, ‘ঢেন্ডেরি’, ‘প্রতিশোধ’, ‘চিঠি’, ‘সুবিমলবাবু’ প্রভৃতি গল্পে প্রান্তজনের জীবন কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেটিই বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে।

২. সাহিত্য পর্যালোচনা

উনিশ শতকে বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব। শুরুটা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। তাঁর গল্পগুলোতে আমরা উচ্চবর্গের মানুষদের কথাই চিত্রায়িত হতে দেখি। তবে তাঁর গল্পে যে নিচুতলার মানুষদের কথা একেবারেই নেই তা বলা যাবে না, তাঁর কিছু গল্পে নিম্নবর্গের জীবন আখ্যান চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে আমরা পাই নিম্নবর্গ নারীর চিত্র; তাদের যন্ত্রণা, দুঃখ, সমাজ ও ধর্মের চাপে দমিত রাখা মনের আবেগ, ভালোবাসা, নিজের মনের কথা। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ পুরোপুরিভাবে সাহিত্যে নিয়ে আসেন নিম্নবর্গের মানুষদের। কুৎসিত, বীভৎস ও দারিদ্রক্লিষ্ট নিম্নবর্গীয় জীবন তাঁদের লেখায় উপস্থাপিত হয়। তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ-মানিক-তারাশঙ্কর তাঁদের আখ্যানে নিয়ে আসেন সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির কথকতা। তাঁদের উত্তরপর্বে সমরেশ বসু, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যবৃন্দ গল্পে চিত্রিত করেন নিম্নবর্গের মানুষ।

> “বাংলাদেশের ছোটগল্পের জগৎটি বৈচিত্র্যময়। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার অনিবার্য প্রভাব ছাড়াও ঔপনিবেশিকের উত্তরাধিকার বাংলা কথাসাহিত্যে অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর উন্মত্ততা বাংলা কথাসাহিত্যের আভ্যন্তর স্বভাবে ঘটায় মৌলিক রূপান্তর। সাতচল্লিশ-উত্তর বাংলাদেশের গল্পে ঘুরেফিরে আসে পুরোনো সামন্তব্যবস্থা, প্রচলিত গ্রাম্যজীবন, মুখ্য হয়ে ওঠে ঘটনার আলেখ্য। কিন্তু সময়ের বাঁকবদলের সঙ্গে সঙ্গে এই ভূখণ্ডের গল্পেও আসে ভাঙাগড়া, তৈরি হয় ভিন্ন ন্যারেটিভ। বায়ান্ন ও একাত্তরের সংগ্রামী চৈতন্য উপরিকাঠামোর মতো গল্পের ভেতরকাঠামোতেও নিয়ে আসে মৌলিক রূপান্তর। স্বাধীনতা-উত্তর উদ্ভিন্ন মধ্যবিত্তশ্রেণি এবং বর্ধিষ্ণু নগরব্যবস্থা আমাদের গল্পে মেট্রোপলিটন আবহের জন্ম দেয়। মধ্যবিত্তের মনোজগৎ, তার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, তার একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতাও গল্পের আখ্যানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে ল্যাংগুয়েজের জায়গায় ঢুকে পড়ে মেটাল্যাংগুয়েজ, প্লটের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়ায় এ্যান্টিহিরো। ইতিহাস ও সময়ের পটে বেড়ে ওঠা সংগ্রামী জীবনই বাংলাদেশের গল্পের প্রাণবীজ” (বোস, ২০১৬, পৃ. ১)।

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে রাজধানী ঢাকাকে ঘিরে রচিত হতে থাকে সাহিত্য, সে সাহিত্যের একটি প্রধান অংশ হিসেবে জায়গা করে নেয় নিম্নবর্গের মানুষ। পঞ্চাশের দশকে আবু ইসহাক, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, সরদার জয়েনউদদীন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহসহ অনেকেই নিম্নবর্গের মানুষদের কথা, তাদের জীবনসংগ্রামের কথা দরদী ভাষায় উপস্থাপন করেন। ষাটের দশকে হাসান আজিজুল হক পূর্বোক্ত ধারার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর গল্পে বড় আঙ্গিক নিয়ে নির্মাণ করেন উচ্চবর্গ কর্তৃক নিম্নবর্গের মানুষের শোষণ, অন্যায় নিপীড়ন, দারিদ্র্যের যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষদের চিত্র। পাশাপশি তাঁর গল্পের চরিত্রের মুখ দিয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করান। তথাকথিত সমাজ যাদেরকে নিচু জাতের আখ্যা দিয়ে অবহেলা করে যেসব অবহেলিত, দরিদ্র, পতিত মানুষদের সংকট, রাজনৈতিক বাস্তবতা, সামাজিক আন্তঃক্রিয়া চিত্রায়ণে হাসান আজিজুল হক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উত্তর

পর্বে আমরা কথাশিল্পী অদ্বৈত মল্লবর্মণ কিংবা হরিশংকর জলদাসের কথা বলতে পারি। কথাশিল্পী অদ্বৈত মল্লবর্মণ উত্তর বাংলাদেশের কথাশিল্পে নিম্নবর্গীয় জীবনচর্যা অঙ্কনে পারদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন হরিশংকর জলদাস। কথাশিল্পী অদ্বৈত মল্লবর্মণ কিংবা হরিশংকর জলদাস ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন নিম্নবর্গের। লক্ষ্যণীয় বিষয় কথাকারদের রচনায় উচ্চবর্গের মানুষের জীবন চিত্রায়ণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাত্য, অন্ত্যজ ও শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের কোলাহল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকে। বরং বলা যায়, এ ক্ষেত্রে অধিকতর শিল্পসার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন কেউ কেউ। সমাজের উচ্চবর্গের দৃষ্টিতে নিম্নবর্গ ছোটলোক, নিজস্বতাহীন, প্রবৃত্তিচালিত, লোলুপ হলেও এসব শব্দ তাদের ওপর উচ্চবর্গ কর্তৃক আরোপিত প্রয়োগ। কিন্তু লেখকরা নিম্নবর্গের জীবনকে বাস্তবতার আলোয় তুলে এনেছেন। নিম্নবর্গের দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব, প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত জীবনকে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত দক্ষতায়। আর এই দক্ষতার শিল্পসঙ্গত রূপ দিয়েছেন হরিশংকর জলদাস। ধীবরগোষ্ঠীর জীবনচিত্র অঙ্কনে তিনি একজন দক্ষ শিল্পী।

> অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) পরে দীর্ঘদিন আর কোনো জলপুত্র কলম হাতে তুলে নেননি। অদ্বৈতের মৃত্যুর ৪৯ বছর পর হরিশংকর জলদাস লিখতে শুরু করলেন। জেলেদের নিয়েই লেখালেখি শুরু করলেন তিনি। অদ্বৈত নদীলগ্ন মানুষদের জীবনকথা লিখে গেছেন, আর হরিশংকর লিখছেন সমুদ্রসংগ্রামী জেলেদের জীবনালেখ্য, তবে নদীমগ্ন মানুষজনও তাঁর কথাসাহিত্যে অবহেলিত নয়। মূলত, হরিশংকর জলদাস জেলেসম্প্রদ্রায়ের দিবারাত্রির কাব্য নির্মাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন (জলদাস, ২০১১, পৃ. ১)।

৩. মূল আলোচনা

হরিশংকর জলদাস নিম্নবর্গকে পর্যবেক্ষণ করেছেন খুব কাছ থেকে। দরিদ্র-দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রান্তিক মানুষ তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য। তিনি নিম্নবর্গের জীবনকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন অনেক শিল্পসফল ছোটগল্প। এসব গল্পে শিল্পিত হয়েছে নিম্নবর্গের জীবনের বিচিত্র প্রান্ত ও প্রবণতা। জলদাসের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের জীবনচর্যা প্রতিফলিত হয়েছে এমন গল্পগুলোকে আমরা তিনটি বর্গে ভাগ করতে পারি।

- নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা: দারিদ্র্য ও অসহায়তার চিত্র
- নিম্নবর্গের নারী: কাহিনির কালিতে নিপীড়িত মানুষ ও তাঁর প্রতিবাদ
- নিম্নবর্গের নৈতিক অবক্ষয় ও জীবনবাস্তবতার নানা প্রসঙ্গ

নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা: দারিদ্র্য ও অসহায়তার চিত্র

বাংলাদেশের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের পাওয়া না পাওয়া, দারিদ্র্য, শোষণ, প্রতিবাদ ইত্যাদি বেশ জোরালো ভাষায় উপস্থাপন করেছেন হরিশংকর জলদাস। তিনি নিম্নবর্গের সমাজ হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন ধীবর সমাজকে; কেননা এ সমাজের মানুষদের তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন খুব কাছ থেকে, তিনিও ছিলেন একজন ধীবর পরিবারের সন্তান; এ পরিবারেই তার বেড়ে ওঠা। হরিশংকর জলদাসের শৈশব, কৈশোর এবং জীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত নিম্নবর্গ ধীবরদের সংস্পর্শে। তার মানস প্রবণতায় এই নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি মমতা, সহানুভূতি এবং টান থাকায় গল্পের মূল প্রেক্ষাপট নিয়ন্ত্রণ করেছে এই মানুষরাই। নিম্নবর্গ সমাজের নিম্নস্তরে বাস করার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক পেশাকে অবলম্বন করে জীবনধারণ করে, যা সমাজে কোনো উচ্চমর্যাদা পায় না। নিম্নবর্গের মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এবং সামাজিকভাবে উচ্চবর্গের নিকট অসম্মানের পাত্র। এই অর্থনৈতিক দৈন্য ও সামাজিক অধস্তনতা তাদেরকে পরিণত করে উচ্চবর্গের অধীন শ্রেণিতে। তখন তাদের কাছে কোনোরকমে জীবনকে বাঁচানোই মূল উপজীব্য হয়ে ওঠে। তাই পেশা নিয়ে তাদের চিন্তাধারাও খুব দুর্বল হয়ে থাকে। গভীর জলে পড়ে গেলে মানুষ যেমন সামনে যা পায় তাই আঁকড়ে ধরে আবার জীবনের স্বাদ পেতে চায়, তেমনি কোনো একটি পেশাকে অবলম্বন করেই তারা জীবনকে অতিবাহিত করার চেষ্টা করে। এককথায় সমাজের নিম্নস্তরে যেমন তাদের বাস তেমনি পেশাও হয়ে থাকে একেবারে অমর্যাদাকর- যার উপর ভর করেই তাদের পরিবার-সমাজ চালিত হয়।

তাঁর রচিত 'কোটনা' গল্পটি নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার এক বাস্তব দলিল। উত্তর পুরুষে লেখা 'কোটনা' গল্পটিতে কথক হিসেবে দেখা যায় মুচিপাড়ার অশোক দাসকে। তার দৃষ্টিকোণ থেকে এগিয়ে চলে গল্প। আট বছর বয়সে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হতে গেলে প্রধান শিক্ষক তাকে ভর্তি করাতে অনীহা প্রকাশ করেন। পাঠক হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতে পারেন ঠিক কী কারণে অশোককে ভর্তি করাতে চাচ্ছেন না প্রধান শিক্ষক। আশঙ্কা সত্যি হয়। শিক্ষক বিড় বিড় করে বলেন, "মুচির ছেলে পড়বে, জুতো সেলাই করবে কে?" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ১০)। হেড মাস্টারের কথার মধ্যে যত না জাত্যাভিমান প্রকাশ পেয়েছে, উঁচু স্তরের মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা যারা মেটান তারাও লেখাপড়া করে জাতে উঠলে ছোট ছোট কাজগুলো করবে কে সেই চিন্তাই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক

বাস্তবতার চিত্রই যেন হেড মাস্টারের চিন্তায় প্রতিফলিত। লেখক অশোকের সাথে জেলেপাড়ার ক্ষীরমোহনও স্কুলে যোগ দেয়। দুজনকেই পেছনের বেঞ্চে বসতে হতো। হেড মাস্টারের নির্দেশ: "ক্লাসের একেবারে শেষ বেঞ্চে বসবি তুই। খবরদার, সামনে বসবার চেষ্টা করবি না কখনো" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ১১)।

গল্পের প্রধান দুই চরিত্র ক্ষীরমোহন এবং অশোক দুজনই সমাজের তথাকথিত নিচু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। একজন মুচির ছেলে, অপরজনের বাবা জেলে। লেখক গল্পে দুজনের জীবনের নিদারুণ সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন। স্কুলের যে মৌলভি সাহেবের কথায় লেখককে স্কুলে ভর্তি নেয়া হয়েছিল, সে মৌলভি সাহেব কোনো এক অজ্ঞাত কারনে ক্ষীরমোহনকে দেখতে পারতেন না। খোঁটা দেয়ার সুযোগ ছাড়তেন না তিনি। "তোদের মাউচ্ছাদের কে বলছে পড়ালেখা করতে? যা যা মাছ ধর গিয়ে" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ১১)।অথচ পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই, এই মৌলভি সাহেবই ক্ষীরমোহনকে ভালোবাসতেন সব চেয়ে বেশি। ক্ষীরমোহনকে আঘাত করে কথা বলার পেছনে মূল কারণই ছিল তাকে পড়াশোনায় ভালো করতে অনুপ্রেরণা দেয়া। সমাজের মানুষের নেতিবাচক মনোভাব ছাড়াও প্রান্তিক সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেও উচ্চ শিক্ষার প্রতি এক ধরনের দ্বিধা কাজ করে। মুচি সম্প্রদায়ের ছেলেরা পড়াশোনা করে না কারণ বাবা-মায়ের ধারণা বেশি লেখাপড়া শিখলে ছেলেরা তাদের আর দেখাশোনা করবে না। অশোকের বাবার বন্ধুর বক্তব্যে বিষয়টা স্পষ্ট হয়: "সংসারের প্রয়োজনে আগামী দিনের ভয়ে মুচিরা ছাওয়ালদের পড়ায় না" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ১৩)।

সামাজিক বাস্তবতায় সমাজের প্রান্তিক মানুষরা তাদের বংশ পদবি কখনো কখনো জলাঞ্জলি দিতে হয়। অশোকের বাবা অশিক্ষিত মুচি হলেও ছিলেন বিচক্ষণ। তিনি জানতেন লেখাপড়া শিখলেও অশোককে প্রতিনিয়ত মুচির ছেলে বলে অপমানিত হতে হবে তাই তিনি নবম শ্রেণিতে ভর্তির সময় অশোকের পদবি পালটে 'চৌধুরী' রেখে দিলেন। ছেলের ভবিষ্যতের বিবেচনা করে একজন মুচি ছেলের নাম থেকে তাদের বংশ কেটে পদবি তুলে দিতে বাধ্য হলেন:

> মুচির ছেলে শিক্ষিত হইয়া চাকরি করবে। জীবনে অনেক ঠেকা আছে অশোকের। পদবির জইন্য বারবার লাঞ্ছিত হইতে হবে তাকে। অপমানের হাত থেকে বাঁচতে হইলে অশোককে পদবি বদলানো দরকার (জলদাস, ২০১১, পৃ. ১৭)।

'কোটনা' গল্পটি কথকের স্মৃতিচারণমূলক গল্প। মধ্যবয়সে এসে ছেলেবেলার বন্ধু ক্ষীরমোহনের দেখা পায় সে, যে কিনা হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিল। এভাবে কেন হারিয়ে গেল এমন প্রশ্নে ক্ষীরমোহনের জবাব-"আমি ঢাকায় চলে গিয়েছিলাম সেদিন। তারপর মানুষকে জিজ্ঞেস করে করে নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে। হ্যাঁ, বেশ্যাপাড়ায় গিয়ে বেশ্যার দালালি করেছি আমি এতোদিন" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ২০)। কিছুক্ষণ পর সে জানালো-"বেশ্যার পোলার কোটনা হওয়াই স্বাভাবিক" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ২০)। গল্পটিতে মনে হতে পারে এতে ক্ষীরমোহনের মায়ের কাহিনী বর্ণিত। আসলে এই গল্পে লেখক অত্যন্ত নিদারুণভাবে জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় জীবন সংগ্রামের নির্মম চালচিত্র বর্ণনা করেছেন। জলে হোক বা স্থলে, সমানতালে যুদ্ধ করে যেতে হয় জেলেদের । রাতের পর রাত জীবিকার সন্ধানে সমুদ্রে কাটায় জেলেরা। এই সুযোগে জেলেবউদের অনেকেই লিপ্ত হয় নিষিদ্ধ সম্পর্কে। তাদের পরিবার পরিজনদের কাছে অজানা থাকেনা কিছুই। কেউ চেপে যায় আবার কেউ হয়তো সহ্য করতে না পেরে ক্ষীরমোহনের মতো হারিয়ে যায়। এই গল্পে জেলেদের দাম্পত্য ও আর্থ-সামিজক জীবনের প্রতিকূলতা ফুটে উঠে সুস্পষ্টভাবে।

নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার একটি চমৎকার আলেখ্য 'দুখিনী' গল্পটি। মনমোহন দাসের মা অনন্তবালা আলোচ্য গল্পের 'দুখিনী'। মনমোহনের বাবা কেষ্টপদ অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভে অবস্থাপন্ন এক জেলের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে অনন্তবালা ও তার দুই ছেলেকে ভুলে গেল। ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিল অনন্তবালা।

> শেষ পর্যন্ত নিরূপায় হয়ে সে একদিন অন্ধ ছেলেটির হাত ধরে পূর্ণ বহদ্দারের উঠানে গিয়ে দাঁড়াল। উচ্চস্বরে বলল, 'অ জেডিমা, আঁরে কিছু ভিক্ষা দাও। আঁর' পোয়া অলেরে বাঁচাই রাইবারলাই আঁরে কিছু চইল-ডাইল দাও (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৪১)।

এভাবেই ভিক্ষা করেই দশ বছর কাটিয়ে দেয় অনন্তবালা। "সেই-ই শুরু। এরপর দীর্ঘ দশটি বছর ভিক্ষা করে সে দুটো সন্তানকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদের বড় করে তুলেছে" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৪১)। তারপর সীমাহীন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে দুই ছেলেকে মানুষ করলেন তিনি। "দুখিনী মা তার। জীবনের কয়েকটি বছর ভিক্ষা করে করে দুই ভাইকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এই অসহায় নারীটি" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৪১)। কিন্তু সন্তান মানুষ করে কি দুঃখ ঘুচেছিল অনন্তবালার? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই গল্পের শেষে। অনন্তবালা জীবনে সুখের দেখা পেয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। বড় ছেলে মনমোহন যখন স্বাবলম্বী হলো তারপর কিছুদিন সুখেই ছিল অনন্তবালা। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! বাপ

কেষ্টপদের বিরাটকার নৌকার নিচে পিষেই প্রাণ দিতে হলো মনমোহনকে। মরার আগে সঙ্গী কালাবাঁশিকে বলে গেল,- "কাঁলাবাশিরে, তুই যদি বাচস আঁর দুখিনী মা উয়ারে চাইস" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৪৩)। কাঁলাবাশির পরিণতির খবর জানা যায়না। দুখিনী অনন্তবালার প্রতিক্রিয়া লেখক আর দেখাননি। বলাই বাহুল্য, অনন্ত জনম দুখী। তার অবস্থার কথা পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারবে।

নিম্নবর্গের নারী: কাহিনির কালিতে নিপীড়িত মানুষ ও তাঁর প্রতিবাদ

হরিশংকর জলদাস বাংলা সাহিত্যের একজন উত্তর আধুনিক শিল্পী। উত্তর আধুনিক শিল্পীরা শ্রেণিবিভেদ প্রথা লুপ্ত করে তাদের লেখায় সমাজে বিদ্যমান সকল শ্রেণিকে সমান চোখে দেখেন। তবে তিনি তাঁর লেখায় সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণিকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী কথাকার হিসেবে তাঁর রচনাতে জীবনবাস্তবতা অনেকটা জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের নিম্নবর্ণের কৈবর্ত সমাজের ছবি ধরা পড়েছে তাঁর গল্পে। আঞ্চলিকতা ও জীবনবাস্তবতার সমন্বয়ে এই গল্পগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধে তাঁর লেখা ছোটগল্পে প্রান্তজীবন কথাই বিশেষভাবে উঠে আসবে। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থপ্রকাশের সম্পাদক লিখেছেন- জেলে দাম্পত্যজীবন সমবায়ী। এ জীবনে নারী পুরুষের সমান অবদান। কিন্তু অন্যান্য সমাজের মতো জেলে নারীও বঞ্চিত-অবহেলিত। তাদের মর্মন্তুদ হাহাকার, বিপর্যয়-বিপন্নতার বেদনাজীর্ণ গৃহকোণে গুমরে মরে হরিশংকর জলদাসের গল্পে।

নিম্নবর্গের নারীর জীবনচর্যা অঙ্কনে হরিশংকর জলদাস সিদ্ধহস্ত। অন্ত্যজ নিপীড়িত নারীর একটি চমৎকার আলেখ্য 'দুলারি এবং কয়েকজন' গল্পটি। জেলে সম্প্রদায়ের অনেকেই সময়ের সাথে সাথে পেশা বদলায়। নারীরা শহরে আসে গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে চাকরি করতে। দুলারি তাদের অন্যতম। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে বিয়ে করে বসে লম্পট শ্যামল দত্তকে। বিয়ের পর জানতে পারে শ্যামল দত্তের আগের পক্ষে স্ত্রী সন্তান রয়েছে। দুলারি জবাব চাইলে আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে শ্যামল দত্তের। সে বলে: "জাইল্লার মাইয়ারে বিয়া কইরা এই শ্যামল দত্ত তোমারে জাতে তুলছে"(জলদাস, ২০১১, পৃ. ৯৪)। সেই চিরাচরিত জাত্যাভিমান! যেন দুলারি জেলের মেয়ে বলে জাতিগত হীনমন্যতায় ভুগছিল, শ্যামল দত্ত এসে উদ্ধার করেছে। দুলারি এরপর মেয়ে নিয়ে বিপাকে পড়ে। অমানুষের লোলুপতার শিকার হয়ে শেষমেষ ঠাঁই হয় এক ভদ্রপাড়ায়। এক অধ্যাপকের বাড়ির নিচে। অধ্যাপকের মতো নিরীহ মানুষটি একদিন এক নির্মম দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে যান অজান্তে। তবুও প্রতিবাদ করতে অপারগ হোন তিনি। পরদিন তিনি দেখলেন দুলারি চলে গেছে সেখান থেকে।

> অধ্যাপক হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বিবেকের দংশন থেকে আপাতত রেহাই পেলেন তিনি। আবার তাঁর হঠাৎ মনে হল তিনি তো একটা আস্ত অমানুষ, বিবেকহীন, লোম-ওঠা খোঁকিকুত্তা। কুত্তার চেয়েও অধম তিনি। প্রতিবাদে কুত্তারাও খ্যাঁ খ্যাঁ করে ওঠে। তিনি তো তাও করলেন না। গত রাতে, তার চোখের সামনে এত বড় অপরাধটি সংঘটিত হয়ে গেল, তিনি তার কোনো প্রতিবাদ করলেন না। করলেন না কেন তিনি? আসলে তিনি জগদুলদেরই একজন। নইলে কেন তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই বীভৎস দৃশ্য দেখলেন, একটা গলা খাঁকারি দিয়েও প্রতিবাদ করলেন না। তিনি কী তখন এই নগ্নদৃশ্য উপভোগ করছিলেন, ভাল মানুষের অন্তরালে তার ভেতর যে বিকৃতরুচি লুকিয়ে আছে, তাই কি তাঁকে উদ্বোধিত করেছে এই দৃশ্যটিকে রসিয়ে রসিয়ে দেখার জন্যে? (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৯৫)।

উক্ত গল্পটিতে লেখক দুলারিদের মতো মেয়েদের সমাজে কী ধরনের প্রতিকূলতার সাথে টিকে থাকতে হয় তা তুলে ধরেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দুলারিদের নিষ্পাপ অবয়বকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তখন এটাকেই ভবিতব্য মেনে নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।

অন্ত্যজ নারীর জীবনের একটি শিল্পসফল গল্প 'ঢেন্ডেরি'। এই গল্পের মূল নারী চরিত্র লক্ষ্মীবালা, যে একই সাথে নিপীড়িত ও প্রতিবাদী। লক্ষ্মীবালার স্বামী রাইগোপাল জলদাস প্রভাবশালী জেলে। একদিন তার পরকীয়া ধরা পড়ে যায় পাশের বাড়ির রসবালার সাথে।

> অ-ই, আঁর নাম রাইগোয়াল জলদাস। বঙ্গসাগরত্ আঁর দুইয়ান নৌকা চলের। তুই খানকি চাওদ্দে হেই গোয়াইল্লারে শাসন গত্তি। চোখ রাঙিয়ে গর্জন করে ওঠে রাইগোপাল জলদাস (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৪৪)।

গ্রাম বাংলার সর্বংসহা নারীর মতোই চুপচাপ সহ্য করে যেতে পারতো লক্ষ্মীবালা। কিন্তু জেলে পাড়ার এই নারী আর দশজনের মতো নয়-"আঁই খানকি নো, তোঁয়ার বউ। খানকি

অইলে বেশ্যাপাড়ার থাইক্কাম। বউত্ বেডা আঁর হঙ্গে ফুইত্তো। তুইও যাইতা মাঝে মইধ্যে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা কণ্ঠে কথাগুলো বলে রাইগোপালের স্ত্রী লক্ষ্মীবালা"(জলদাস, ২০১১, পৃ. ৪৪)।লক্ষ্মীবালা উচ্চস্বরে কথা বলে না উত্তেজিত হয় না। অনুত্তোজিত কণ্ঠে নিম্নস্বরে সে যা বলে তা শ্রোতার মনকে ছেঁড়াবেড়া করার জন্য যথেষ্ট। স্বামীকে তার কৃতকর্মের শাস্তি দিতে পেরেছিল সে। লক্ষ্মীবালা যেন জেলে পাড়ার প্রতিবাদী নারীদের প্রতিভূ। ঢেন্ডারি দিয়ে স্বামীকে শায়েস্তা করেছিল। কিন্তু তার আগে স্বামীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি জেলেবউ। কিন্তু যখন সে বুঝলো-"যে বিরিষ গরু একবার পরর খেতর ধান খাইয়ে, হেই গরুরে বাঁধি রাখন সম্ভব না"(জলদাস, ২০১১, পৃ. ৫৬)। ঢেন্ডেরি এক জাতের গ্রাম্য শাস্তি। মাথা মুড়িয়ে গলায় জুতার মালা ঝুলিয়ে পুরো গ্রাম ঘোরানোই ঢেন্ডেরি। অপরাধী রাইগোপাল ও রসবালার সাথে তাই করা হয়েছিল।

> সে-রাতে হাতেনাতে ধরা পড়া রাইগোপাল ও রসবালাকে ঢেন্ডারি দেয়া হল। মাথা মুড়িয়ে জুতার মালা গলায় ঝুলিয়ে পেছন পেছন থালা-কাসা-টিন বাজিয়ে গোটা জেলেপাড়া ঘুরানো হল দু'জনকে। পাড়া ঘুরিয়ে তাদের যখন রাইগোপালদের উঠানে আনা হয়, তখন দরজায় খিল লাগিয়ে ছেলে কোলে নিয়ে অঝোর ধারায় কেঁদে যাচ্ছে লক্ষ্মীবালা (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৫৬)।

ঢেন্ডেরির ব্যবস্থা লক্ষ্মীবালা করেছিল নিতান্তই অনিচ্ছায়। তাই স্বামীকে শাস্তি পেতে দেখে অঝোরে কেঁদেছিল সে। স্বামীর কাছে প্রতারিত হলেও কোন স্ত্রী স্বামীর এমন করুণ দশা দেখতে চায় না। নারীর কোমল হৃদয়ের একটি চিত্র লক্ষ্মীবালার মধ্যে আমরা দেখি।

অন্ত্যজ নারীর নিপীড়িত জীবন নিয়ে লেখা জলদাসের আরো একটি শিল্পসফল গল্প 'প্রতিশোধ'। এই গল্পের নামকরণে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও গল্পটির মূল চরিত্র মাধুরীর শেষ পরিণতি পাঠকের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করতে বাধ্য। জেলে সমাজে কোনো মেয়ের নাম মাধুরী রাখার মাধ্যমে চিন্তা চেতনার ভিন্নতা প্রকাশ পায় যা লেখকের জবানিতে স্পষ্ট-

> আমার বোনটির নাম ছিল মাধুরী। মাধুরী নামটি আমাদের সমাজে প্রচলিত নয়। ওই ধরনের নাম হিন্দুসমাজে রাখা হয়। মাধুরী, সুরভি, মৌমিতা, সুরঞ্জনা এই নাম শিক্ষিত হিন্দুসমাজে স্বাভাবিক। কিন্তু জেলেসমাজে ওই নামগুলো খাটে না। এই সমাজে মেয়েদের নাম রাখা হয় অনন্তবালা, উন্মাদিনী, বাদলি, যশোদা, বিন্দুরাণী, নিদেনপক্ষে সবিতা, সুনীতি। কিন্তু মাধুরী? নৈব নৈব চ (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৫৮)।

মাধুরী কথকের একমাত্র ছোটবোন। নামের মতই মাধুর্যপূর্ণ এক মেয়ে। পিতা চট্টগ্রাম স্টিলমিলের সুইপার। জলদাস সম্প্রদায়ের লোক হলেও বাপ-দাদার পেশায় না গিয়ে অন্য পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। স্টিলমিলের জাপানী প্রকৌশলীদের সান্নিধ্যে রুচিরও আশ্চর্যরকমের পরিবর্তন হয়েছে তার। তার ফলস্বরূপ মাধুরীকে গড়ে তুলতে লাগলেন সমাজের শিক্ষিত অংশের আদলে।

> একদিন বাবা ঠিক করল মাধুরীকে গান শেখাবেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত। যেই ভাবনা, সেই কাজ। হিন্দুপাড়ার মৃদুল সেনের কাছ থেকে একট আধ-পুরনো হারমোনিয়াম কিনে আনল। কোত্থেকে বুড়ো এক গানের মাস্টারকে ধরে আনল বাবা। সপ্তাহে দু'সন্ধেয় গান শেখানো শুরু করলেন ষাটোর্ধ্ব পরিমল দে (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৬১)।

কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে জীবনের ছন্দপতন ঘটলো। মেয়ের চিন্তায় অধীর হয়ে তার পড়াশোনা বন্ধ করলেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিলেন।

> বাবার অটল সিদ্ধান্তের কথা শুনে শান্ত মিতভাষী মাধুরী একদিন মুখ খুলেছিল। বলেছিল, বাবা, আমার তো বিয়ার বয়স হয় নাই। তুমি আমাকে পড়াবে বলছিলা। এখন বিয়া দিতে চাও কেন? এখন বিয়া দিও না বাবা আমারে।............কিন্তু আজ মাধুরীর অনুরোধ বা কাকুতি কানে তুলল না। শুধু নরম সুরে বলল, তুমি বুঝবা না মা, আমি তোমার মঙ্গল চাই, বিয়া দিলে তোমার মঙ্গল অইবো (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৬৩)।

মাধুরী স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বাবার চোখে চোখ রেখে বলল, "ঠি-ক আছে বাবা, তুমি যা ভাল বুঝ কর" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৬৪)। কিন্তু মাধুরীর দুর্ভাগ্য। অত্যাচারী শ্বাশুড়ি আর মদখোর স্বামীর নিদারুণ নিপীড়নে নিষ্পেষিত মাধুরীর একদিন সমস্ত মাধুর্য লোপ পেয়ে যায়। চরম অর্থকষ্টে তিল তিল করে শেষ হয়ে যেতে থাকে মাধুরি। অতঃপর লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তার এই দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটে। তার বাবা তখন বুঝতে পারে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ায় মেয়ে বুঝি তার প্রতিশোধ নিয়েছে। "আমি বুঝেছি মাধুরীর অভিমান আমার উপর। আমি তারে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিছি। সে আমার উপর প্রতিশোধ নিছে" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৭০)।

লেখক হরিশংকর জলদাসের গল্পের চরিত্ররা কম বেশি সবাই জেলেপাড়ার অধিবাসী। তবে নিম্নবিত্ত মুসলমান পরিবারের নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার চিত্র যে একেবারেই নেই তা বলা যায় না। 'চিঠি' গল্পটি একটি হতদরিদ্র মুসলিম পরিবারকে কেন্দ্র করে রচিত। পুরো গল্পটি আসলে একটি চিঠি। ধর্ষণের শিকার এক হতভাগী মেয়ের লেখা শেষ চিঠি। মেয়েটি তার বাবাকে উদ্দেশ্য করে চিঠিটি লিখেছিল। "বাবা, আমি গেলাম। আমার জন্য আফসোস করো না। তোমাদের কাছে থাকতে পারলাম না বলে কষ্ট লাগছে আমার" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ২৬)।

এতোখানি পড়ে পাঠকদের মনে কৌতুহল জাগে। মেয়েটি কোথায় যাচ্ছে? কেনই বা যাচ্ছে? ধীরে ধীরে চিঠি বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে থাকে। আমরা জানতে পারি চিঠিটি লিখেছে এক দুর্দান্ত মেধাবী মেয়ে। মেয়েটির বাবা এক হতদরিদ্র গরিব চাষী। বাবা চাননি তার মেয়ে হোক। তবুও সৃষ্টিকর্তা এই শ্যামবর্ণের মেয়েটিকে তার ঘরে পাঠালেন। "আমাকে দেখে বাবা তোমার মুখটা নাকি শক্ত হয়ে গিয়েছিল। মায়ের সঙ্গে তুমি দুই-তিন দিন কথা পর্যন্ত বলোনি" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ২৭)।

মেয়েটির জবানি থেকে জানা যায়, পুত্রের আশায় ফের গর্ভবতী হোন মেয়েটির মা। মেয়েটি একরাশ অভিমান ভরে লিখলো।

> বাবা, তোমাকে আজ লিখতে আমার লজ্জা করছে না-তুমি ছেলের জন্য মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিলে। মায়ের অক্ষমতার দিকে তাকাওনি তুমি। মায়ের ইচ্ছেরও কোনো মূল্য দাওনি। আমি মায়ের বুকের দুধ পাব কিনা, দুধ না পেলে গরিব চাষির মেয়েটি বাঁচবে কিনা-তা তুমি ভাবতে রাজি ছিলে না। তুমি নাকি শুধু বলতে, 'আমার ছাওয়াল চাই। বংশে বাত্তি জ্বালাবার লাইগ্যা ছাওয়াল দরকার আমার। মাইয়া দিয়া বংশ রক্ষা অয় না' (জলদাস, ২০১১, পৃ. ২৭)।

পুত্র সন্তানলিপ্সু দরিদ্র পিতার অমানবিক আচরণ পরিষ্কারভাবে এখানে ফুটে উঠেছে। অবশেষে তেরো মাস বয়সে মেয়েটি পেল একটা ভাই। মেয়েটি লিখেছে-

> ছেলের মুখ দেখে তুমি নাকি আনন্দে কেঁদে দিয়েছিলে। বলেছিলে, 'আজ আমার খুব আনন্দের দিন, খুশি আমার ভিতর যে কিভাবে খলবল করতাছে তা তোমারে বুঝাইতে পারুম না, আমেনা। তোমারে মাথায় তুইল্যা নাচতে ইচ্ছে করতাছে' (জলদাস, ২০১১, পৃ. ২৮)।

কিন্তু চার বছর বয়সে এসে তারা বুঝতে পারে, ছেলেটি মানসিক দিক থেকে অপরিণত। যে ছেলেকে নিয়ে মেয়েটির বাবার এতো স্বপ্ন, সে স্বপ্ন মুহূর্তেই ভেঙ্গে গেল। খারাপ শোনালেও মেয়েটির বাবা এবার মেয়েটির দিকে ফিরলেন। তাকে পড়াশোনার করানোর সুযোগ দিলেন। মেয়েটিও বুঝলো, তার বাবার মন জয় করার এটাই সুযোগ।

চিঠিটির লেখিকা মেয়েটি দুর্দান্ত মেধার স্বাক্ষর দিলেও এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সে নিতান্তই শরীর সর্বস্ব এক প্রাণি ছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে, এক্সট্রা ক্লাসের ছলে ধর্ষণের শিকার হয় মেয়েটি।

> মিনিট পনেরো পরে আমি মুক্তি পেলাম হান্নান স্যারের হাত থেকে। ফিরবার সময় বোকা ভাইটি আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করল, 'বুবু, পড়াইলো না মাস্টারে?' 'তাড়াতাড়ি ছুডি দিল! তাড়াতাড়ি চল, পুকুরে খুব মজা কইরা আইজ গোসল করুম দুইজনে' (জলদাস, ২০২০, পৃ. ৩৫)।

এমন মর্মান্তিক ঘটনার পর মেয়েটির পরিণতি কী হয়েছিল তা বুঝতে পাঠকের বুঝতে বাকি থাকে না। গল্পটি শেষ হয়, এই লাইনটির মাধ্যমে। "পরদিন সকালে উঠানের আমগাছের ডালে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় চাষির মেয়েটিকে দেখতে পেল সবাই" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৩৬)।

হরিশংকর জলদাস তার গল্পে শুনিয়েছেন নিম্নবর্গীয় মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সাতকাহন। নিম্নবর্গীয় নিপীড়িত নারীর চরিত্র নির্মাণে তিনি যেন এক দক্ষ শিল্পী।

নিম্নবর্গের নৈতিক অবক্ষয় ও জীবনবাস্তবতার নানা প্রসঙ্গ

হরিশংকর জলদাসের 'সুবিমলবাবু' গল্পটিতে নিম্নবর্গীয়দের নিদারুণ দুঃখময় জীবন যতটা প্রকাশ পেয়েছে তার থেকে বেশি প্রকাশ পেয়েছে মানুষের আদিম কামনার স্বরূপ। যেহেতু লেখক হরিশংকরের রচনাগুলোতে প্রধান চরিত্র হিসেবে জলদাস বা জেলে, মুচি এবং পতিতাদের মতো সমাজের অবহেলিতদের আমরা দেখতে পাই তাই এই গল্পে ব্রাহ্মণ গোত্রীয় সুবিমল গাঙ্গুলীকে প্রধান চরিত্রে দেখে একটু খটকা জাগে। গল্পটি পড়তে শুরু করলে পাঠক প্রথমেই ধরতে পারবেন না যে কী ঘটতে যাচ্ছে। সাধারন এক কলেজ শিক্ষক সুবিমল গঙ্গোপাধ্যায়। যিনি জাত-পাতের ব্যাপারগুলো কঠিনভাবে মেনে চলেন। কর্মস্থলে মুসলমান ও নিম্ন গোত্রের হিন্দুদের ছোঁয়া বাঁচাতে নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করেন। তার সাফ জবাব- "মেসে নানা জাতের মানুষ খায়।

নাথ, রায় চৌধুরী, মসুলমান। ওদের সাথে আমি খাবো কী করে? খেতে পারি না" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৩১)।

এমনকি, কুলীন বংশের উপযুক্ত পাত্র পাননি বলে বোনদের বিয়েও দেননি তিনি। বোনের বিয়ে দিতে পারেননি বলে অনুশোচনায় নিজেও বিয়ে করেননি। এটুকু পড়ার পর গল্পে আসে সুজলা চক্রবর্তী। সুজলা বাল্য বিধবা। সুবিমল বাবুর দুই বোনের ফুট ফরমাশ খাটে। একদিন সন্ধ্যাবেলা, সুবিমলবাবুর সুজলাকে দেখে বহুকাল ধরে দমিয়ে রাখা শরীর জেগে উঠে। "সুবিমল বাবু সুজলার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কেন জানি তার দৃষ্টি কিলবিলিয়ে উঠলো" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৩৬)। এতে বিচলিত হয়ে যান সুবিমল বাবু। বহুবছরের অবদমিত কামনা যেন আর বাঁধ মানছে না তার। ফলে ছুটি শেষ হওয়ার আগে বাড়ি ফিরে আসেন তিনি।

অকৃতদার সুবিমলবাবু নিজের অবদমিত কামনা দমিয়ে জীবন কাটিয়ে এসেছেন। কিন্তু এরপর পারলেন না। আরেক বিধবা গৃহকর্মী মালতির ভরা যৌবন দেখে ভুলে গেলেন এতো দিনের সংস্কার, জাত-পাতের অহমিকা। "ভেতরটা এলোমেলোভাবে ভাঙ্গতে শুরু করলো তার। কান দিয়ে গরম হাওয়া বেরোতে লাগলো" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৩৭)। সুবিমলবাবু ভোগ করলেন মালতিকে। মালতি জলদাসী অসুস্থ্য সুবিমলবাবুর দেখাশোনো করতে এসে খুইয়ে বসলো তার সর্বস্ব। বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতিতে সমাজের নিম্নবিত্ত ও গোত্রের মানুষ জীবিকার তাগিদে যেকোনো ধরনের অন্যায়ের সাথে আপোষ করে নেয়। মালতিও তার ব্যতিক্রম কিছু নয়। তবুও একবার চেষ্টা করেছিল প্রতিহত করতেঃ "আপনি শুদ্ধ ব্রাহ্মাণ ছার, আমি সামান্য জলদাসী" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৩৭)। গল্পে লেখক আসলে জাত-পাত নিয়ে খুতখুতে স্বভাবে দাম্ভিকদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন, মানুষের যৌন বাসনা ঠিকঠাক পূরণ না হলে ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধাগ্রস্ত হয়। বিকৃত মনোবাসনা জেগে ওঠে। এরই জলন্ত প্রমাণ সুবিমল গাঙ্গুলী। নিচু জাতের মালতিকে ভোগ করতে তার বিবেকে বাঁধেনি।

হরিশংকর জলদাস অত্যন্ত নিদারুণভাবে নিম্নবর্গের জীবন সংগ্রামের নির্মম চালচিত্র বর্ণনা করেছেন তাঁর গল্পে। বিশেষ করে ধীবর সমাজের কথকতা তাঁর গল্পে সবচেয়ে বেশি প্রতীয়মান। ধীবরদের জলে হোক বা স্থলে, সমানতালে যুদ্ধ করে যেতে হয়। তারা দিনের পর দিন রাতের পর রাত জীবিকার সন্ধানে সমুদ্রে কাটায়। এই সুযোগে জেলেবউদের অনেকেই নীতি- নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে লিপ্ত হয় অবৈধ প্রণয়ে। তেমনি একটি গল্প 'কোটনা'। 'কোটনা' শব্দের অর্থ "অবৈধ প্রণয়ে মধ্যস্থতাকারী"। অথবা সহজ ভাষায় বলতে গেলে পতিতাদের দালালকে বলা হয় 'কোটনা'। ক্ষীরমোহন ছিল গল্পের 'কোটনা'। মা আর কাকার অবৈধ প্রেমের নীরব সাক্ষী ছিল সে। তবে নামের সাথে গল্পটি কতটা প্রাসঙ্গিক তা প্রথমে পাঠকের বুঝতে খানিকটা বেগ পেতে হয়। কিন্তু এক পর্যায়ে ক্ষীরমোহন যখন বলে- "কি জানি কেন মা আইজ সকালে বিছানা থেকে উঠে নাই। গহিন রাতে ঘুম ভাঙ্গি গেলে বাপের চাপা গর্জন শুনেছিলাম। 'লাঙ' এরকম একটা শব্দ শুনেছিলাম" (জলদাস, ২০১১, পৃ. ৩৭)।

৪. উপসংহার

হরিশংকর জলদাসের গল্পে আখ্যান নির্মাণে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে 'ধীবর সমাজ'; যে সমাজের মানুষ ক্ষুধা-দারিদ্র্য, শোষণ-বঞ্চনায় ক্ষতবিক্ষত। রণজিৎ গুহের মতানুসারে, কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত গ্রামের খেতমজুর, গরিব চাষি ও প্রায়-গরিব মাঝারি চাষি, ধনী কৃষকরাও নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য। তার চারপাশে এই মানুষদেরই দেখেছেন, ভিটেটুকু বাদ দিলে এক টুকরো জমিও নেই যাদের। দিনরাত খেটে যে ফসল পায়, তা দিয়ে অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা মেটানো সম্ভব হয় না। এমন মানবেতর জীবনযাপনকারী মানুষদের তিনি গল্পের প্রাণকেন্দ্রে রেখেছেন। কৃষক সমাজ ছাড়াও দেহজীবী তথা পতিতা সমাজ, নাপিত, পকেটমার, চোর, বাগদী প্রভৃতি সমাজের নিম্নবর্গের মানুষরাও গল্পে ওঠে এসেছে।

আমরা হরিশংকর জলাদাসের গল্পে পাই দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট, অনেকটা ছিন্নমূল মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচারের ও জীবনসংগ্রামের স্পষ্ট বিবরণ। একদা ধীবরসম্প্রদায়ের আলোকিত অতীত ছিল। প্রাচীন মহাভারত, গীতা ও নানা পুরাণে একথার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। একটা সময় বিভিন্ন যাগযজ্ঞে, রাজকীয় অনুষ্ঠানে সসম্মানে অংশগ্রহণ করার অধিকার ছিল ধীবরদের। কিন্তু বিবর্তিত প্রথাগত সংস্কারের জাঁতাকলে পড়ে আজ তারা অবনমিত, অবহেলিত। বর্তমান জেলেরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক বৈষম্যের শিকার। বিত্ত ও বর্ণগর্বিত সমাজে নিন্দিত সম্প্রদায়গুলোর অন্যতম

হলো ধীবরসম্প্রদায়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাহিত্যিক হিসেবে হরিশংকর জলদাস তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পের কাহিনী ও চরিত্রের রয়েছে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। বিত্তহীন মানুষের জীবনে ক্ষুধা মুক্তিই বড় কথা। এই সত্যই যেন জলদাসের গল্পে প্রকাশিত। সর্বোপরি হরিশংকর জলদাস বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের একজন দক্ষ রূপকার। নিম্নবর্গের জীবনচর্যা তিনি তাঁর লেখায় যত দরদ দিয়ে চিত্রায়িত করেছেন তা বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে খুম কম সাহিত্যিকের মধ্যে দেখা যায়। নিম্নবর্গের আনন্দ-বেদনা, উৎপত্তি-বিকাশ, তাদের সামজিক ও অর্থনৈতিক জীবন তাঁর লেখায় চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর লেখায় সবসময়ই উঠে এসেছে নিপীড়িত, অন্ত্যজ এবং কিছু যাদের নেই, যারা কেউ নয় অর্থাৎ নিচুতলার মানুষের কথা। প্রান্তজীবনের ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার পাশাপাশি তাঁর যাপিত জীবনচর্চার বহুমাত্রিক সমস্যা রূপায়িত হয়েছে তাঁর গল্পে। শুধু টিকে থাকার জন্য, নিজের অস্তিত্বকে ধরে রাখার জন্য, জীবনসংগ্রামে ছুটে চলা মানুষের জীবন-বাস্তবতার সাক্ষী তাঁর গল্প। ফলে গল্পগুলো জীবন-জিজ্ঞাসা ও সমাজবাস্তবতার অনবদ্য দলিল হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

Johnston, R. (1965). The Concept of the 'Marginal Man: A NEW APPROACH. International Migration, 3(1 - 2), 47-51.

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (প্রকাশক), আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০ মে ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংশোধিত মুদ্রন আগস্ট, ২০০০।

পার্থ চট্টোপাধায়। 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস'। নিম্নবর্গের ইতিহাস। সম্পাদক: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধায়। পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮, কলকাতা।

মোঃ মেহেদী হাসান। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন। মনন প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮।

Chakrabarty, D. (1998). Minority histories, subaltern pasts. Scrutiny2, 3(1), 4-15.

চঞ্চল কুমার বোস, বাংলাদেশের ছোটগল্প জীবনজলধির শিল্প, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৬।

হরিশংকর জলদাস, জলদাসীর গল্প, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

হরিশঙ্কর জলদাস, শ্রেষ্ঠ গল্প, আলোঘর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০২০।